ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও তার আর্থ সামাজিক প্রভাব

সুনীলকুমার দে

প্রেক্ষাপট

ইংরেজরা যখন পূর্ব ভারতে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হচ্ছিল, তখন স্থির করলো ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভাজিত করে দিলে তাদের পক্ষে শাসন কায়েম রাখা সুবিধা হবে। লর্ড কার্জন প্রশাসনিক কাজের সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে 'বিভাজন এবং শাসন' (ডিভাইড এন্ড রুল) নীতি কায়েম করার পরিকল্পনা করলেন।[১] সেই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই তদানিন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করার সরকারি ঘোষণা জারি করলেন। যাকে বলা হয় 'বঙ্গভঙ্গ', ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন যখন দানাবদ্ধ হচ্ছে তা দেখে ভীত হয়ে লর্ড কার্জন স্থির করলেন যে বঙ্গদেশের পূর্ব দিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তা হবে মুসলিম রাষ্ট্রে আর পশ্চিম দিক হবে হিন্দু রাষ্ট্র। যদি কার্জনের এই নীতির পরিকল্পনাকালে তারই অধীনস্ত আসামের মুখ্য কমিশনার হেনরি জন স্ট্যাডম্যান কটন তার কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড কার্জন ও তার মুখ্য সচিব মিলে সরকারিভাবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন।[২]

এই বিভাগ অনুযায়ী বঙ্গদেশের দক্ষিণ অংশ দুটি প্রদেশে ভাগ হলো ঃ (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও অধিকাংশ বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যা সমৃদ্ধ পাটনা ভাগলপুর, বর্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি নিয়ে গঠিত হলো 'বঙ্গপ্রদেশ', যার মুখ্য কার্যালয় ছিল কলকাতা, (২) পূর্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা সমৃদ্ধ এলাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা, কুমিল্লা, আসাম, সিলেট, এবং ত্রিপুরা নিয়ে গঠিত হলো "পূর্ববঙ্গ এবং আসাম" প্রদেশ, যার মুখ্য কার্যালয় হল ঢাকা। পরবর্তীকালে এই বিভাজনকে ভাষা এবং জাতির ভিত্তিতে আবার পুনর্বিন্যস্ত করা হল। হিন্দিভাষী ছোটনাগপুর চলে এলো কেন্দ্রীয় প্রদেশে, আর ওড়িশা ও সম্বলপুর যুক্ত হলো বঙ্গপ্রদেশ এর সঙ্গে।

ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গদেশের এই বিভাজন জনগণের মধ্যে প্রবল ক্রোধের সঞ্চার করে এবং ক্রমে ক্রমে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের অংশ থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শুরু করলো স্বদেশী আন্দোলন। ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন করা, বিভিন্ন সভা ও মিছিল সংগঠিত করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রদানের মাধ্যমে চলতে থাকে এই আন্দোলন।[৩] পূর্ববঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার জনগণ মনে করলো যে এই বিভাজনের মাধ্যমে শিক্ষা এবং চাকুরীক্ষেত্রে তাদের অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যার জন্য তারা স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠন করে মুসলিম লীগ নামক সংগঠন।[৪] ক্রমাগত এই রাজনৈতিক আন্দোলন ও কূটনৈতিক চাপের বশবর্তী হয়ে তদানীন্তন ইংরেজ শাসক লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাভাষীদের

অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় দুই বঙ্গকে একত্রিত করে দেন। এর মাধ্যমে আবার নুতন প্রশাসনিক বিভাগ তৈরী হলো ঃ পশ্চিমে বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ, পূর্বে অসম প্রদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গ প্রদেশ। এই পুনর্বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানীও কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলো। নবগঠিত এই বঙ্গপ্রদেশের মোট আয়তন ছিল ৪৯০,০০০ বর্গ কিমি (১৮৯,০০০ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ছিল ৭৮.৫ মিলিয়ন।

ভারতের স্বাধীনতা ও পুনর্বিভাজন

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভাজনের অঙ্গ হিসাবে দ্বিতীয়বারের জন্য আবার ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গদেশ বিভাজিত হলো। যার মাধ্যমে সৃষ্টি হলো দুটো ভিন্ন রাষ্ট্রের—ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করে দিলেন তদানীন্তন আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ণায়ক সংস্থার চেয়ারম্যান স্যার সাইরিল রেডক্লিফ, যদিও তিনি তার জীবদ্দশাতে কখনো ভারতে আসেননি।[৫] তার নামানুসারে এই সীমানার নাম দেওয়া হলো রেডক্লিফ রেখা।[৬] বঙ্গপ্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটা আলাদা দেশ হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান নাম (যা পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা চালিত হতো), আর একটি চলে এলো স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে, যার নাম হলো পশ্চিমবঙ্গ। সমভাষা, সমখাদ্যাভ্যাস, সমসংস্কৃতি, সমপোশাক পরিচ্ছদ সম্পন্ন একই বঙ্গপ্রদেশে মা হয়ে গেলেন দ্বিখণ্ডিত। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হওয়া দুই বঙ্গের মতের অমিল শুরু হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা টিকিয়ে রাখার আন্দোলনও শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান উর্দু ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা থেকেই এই আন্দোলনের শুরু। ১৯৪৮ স্ল্যাবের ১১ মার্চ সকল বাংলাভাষী জনগণ রাস্তায় নেমে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন যাদের মধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার হন এবং অনেকে মৃত্যুবরণও করেন। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও কিছু করার নেই, কারণ পূর্ব পাকিস্তান তখন আলাদা দেশ হয়ে গেছে। এই আন্দোলন স্তিমিত করতে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহম্মদ আলী জিন্না ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় পদার্পন করেন এবং ২১ মার্চ উর্দু ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল খাওয়াজা নিজামুজ্জিন ও তার পূর্বসূরির রাস্তাতেই চললেন।[৭] তার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে গেল বাংলা ভাষা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। লাগাতার প্রতিবাদ, সভা, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।[৮] প্রতিদানে চলে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিরীহ ছাত্রেরপ্রাণ। ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জমায়েত হলো প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এভং শুরু হলো বৃহত্তর আন্দোলন। এই আন্দোলন চলার প্রায় দুই বছর পর ১৯৫৪ সালের ৭ মে পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভা বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করলেন এবং ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধানেও এই ভাষাকে অন্তভুক্ত করে নিলেন। ভাষা আন্দোলনের শুরুর এই দিনটিকে তাই 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে।[৯]